ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1086-1091
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.108

উপন্যাস ‘বাঁধনহারা’: নজরুলের প্রজ্বলিত আত্মদীপ

ড. মানস জানা, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ (অটোনমাস), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: .21.05.2025; Accepted: 24.05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

“Badhanhara" is the first successful epistolary novel in Bengali literature, consisting of 18 letters. The central theme revolves around the emotionally charged love story of Mahbuba and Nurul Huda. The protagonist, Nurul, like his creator (Kazi Nazrul Islam), is both a poet and a soldier—a free-spirited wanderer. Through Nurul Huda’s character, Nazrul portrays his own romanticism, rebellious spirit, and unrestrained way of life. Nurul breaks off his marriage amidst difficult circumstances and goes to war. Two women shape his life-Mahbuba and Sofia-leading him to emotional turmoil. This forms the crux of the novel’s plot. Two other notable aspects of the novel are secularism and women’s dignity. Nazrul firmly believed that religious beliefs and practices should remain personal and should not dictate state or social policies. The novel features two remarkable female characters. Sahashikadi, a progressive, educated, and independent headmistress of a Brahmo school and Rabeya, the beloved wife of Rabiul, who is revered as Bhabijaan (elder sister). Even Mahbuba, in the end, refuses to conform to marriage, asserting her individuality. Nazrul experimented with a blend of realism and emotional intensity. Despite the communal frenzy of the time, Nazrul’s literature consistently advocated for Hindu-Muslim unity. The novel embodies his dream of a united India, where people rise above religious divides as one nation. This vision reflects Nazrul’s lifelong philosophy, struggles, and self-realization.

"Badhanhara" thus stands as a bold literary experiment -a fusion of love, rebellion, and social reform -mirroring Nazrul’s own revolutionary spirit.

Keywords: Epistolary Novel, Muslim India, Secularism, Women's Dignity, Independence

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার এলবার্ট হলে ‘নজরুল সম্বর্ধনা সমিতি’র পক্ষ থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। সেই সম্বর্ধনা সভায় প্রতিভাষণে নজরুল বলেছিলেন,

> “বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযান সেনাদলের তূর্য-বাদকের একজন আমি--- এই হোক আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়।... আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে, তাকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি।” (ইসলাম, ২০০১, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৪৭৭- ৪৭৮)

উপন্যাস যে সামাজিক যোগাযোগ গড়ে তোলে। এযাবৎ তার সৃষ্টিকেন্দ্রে মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। নজরুল উপন্যাস জীবননির্ভর, সমাজনির্ভর। তিনি বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী ধারার স্রষ্টা, যিনি দুঃখী, বেদনাভারাতুর হতভাগ্যদের

একজন হয়ে বেদনার গান গেয়েছেন। নজরুলের কবিতা ও গান নিয়ে যত আলোচনা হয়, সেই তুলনায় উপন্যাস নিয়ে আলোচনা হয় খুবই স্বল্প। বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরবর্তীকালে নজরুল তিনটি উপন্যাস রচনা করেন—'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' ও 'কুহেলিকা'। 'বাঁধনহারা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে (শ্রাবণ ১৩৩৪)। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩২৭) থেকে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ গ্রন্থাকারে প্রকাশনার সাত বছর আগে থেকে ১৯২০ সালের এপ্রিল সংখ্যার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বাঁধনহারা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক পত্রোপন্যাস। উপন্যাসটিতে ১৮ টি পত্র আছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় মাহ্‌বুবা ও নূরুল হুদার আবেগ সংরক্ত প্রেম। দুই নারী এসে দাঁড়িয়েছে নূরুলের জীবনে -- মাহ্‌বুবা এবং সোফিয়া। নূরুলের চিন্তায় তা নিয়ে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং মাহ্‌বুবার সঙ্গে বিয়ের সমস্ত পাকা আয়োজন ভেঙে দিয়ে যুদ্ধে চলে যাওয়া-- মূল কাহিনি হলো এই। আলোচকরা মূলত চরিত্র, কাহিনি, গঠনশৈলী, ভাষা অর্থাৎ এটি উপন্যাস হিসেবে কতখানি সার্থক সৃষ্টি, নাকি ব্যর্থ তা নিয়েই বিশ্লেষণ করে থাকেন। কিন্তু এই উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যে জাতি, সমাজ ও দেশভাবনা তা নিয়ে আলোকপাত করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

নজরুলের শিল্পভাবনা:

লেখকের ব্যক্তিচিন্তা, ব্যক্তিগত আবেগ কোনোভাবেই সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। তা কোনো না কোনো সমাজচিন্তা, সমাজভাবনার ব্যক্তিকৃত রূপ। শিল্প অর্থাৎ আর্ট - তা গল্প, উপন্যাস, কাব্য বা নাটক যাই হোক না কেন, তার লক্ষ্য আনন্দ বা মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করা ; অভেদ - সুন্দর সাম্যের চিন্তা তুলে ধরা, যার মধ্য দিয়ে মানবচিন্তায় উন্নত উপলব্ধি প্রোথিত হয়। সমাজের অনেক অন্যায়, চাপা পড়া দীর্ঘশ্বাস, হতাশা, গুমরে ওঠা কান্না রূপ পায় চরিত্রে। পুরনো প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার - যুগ যুগ ধরে চলে আসছে বলেই তা সত্য নয়। যুক্তির কষ্টিপাথরে যা একদিন না একদিন সমাজে আসা উচিত, সেই অনাগত কালের কথা, তার ইঙ্গিত, তা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরবে সাহিত্য। নজরুল যা কাব্যের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে উঠতে পারেননি, প্রবন্ধে - অভিভাষণে যা স্পষ্ট করতে পারেননি, সেই ভাবকে চরিত্রে রূপ দিয়ে অধিকতর সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

> "আর্টকে সৃষ্টি, আনন্দ বা মানুষ এবং প্রকৃতি (man plus nature) ইত্যাদি অনেক কিছু বলা যাইতে পারে; তবে সত্যের প্রকাশই হইতেছে ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।" (ইসলাম,২০০১, প্রথম খন্ড, পৃ: ৪২৭)

নজরুল কেবল শিল্পচর্চার জন্য সাহিত্য লিখতে বসেননি। যে সামাজিক - অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল, তা থেকে উত্তরণ সাহিত্যের মধ্য দিয়েই সম্ভব, একথা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। আমরা দেখতে চাই, তাঁর ভাবনাগুলো চরিত্রের সঙ্গে যথাযথ সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে কি না! নজরুলের সজাগ শিল্পী মানসিকতার প্রকৃতিটাকে অনুধাবন করলে এ দ্বন্দ্ব থাকে না। তাঁর ছিল খেয়ালি, জেদি, একরোখা মনোভঙ্গি। 'কল্লোল'-এর প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। যা কিছু পুরাতন, গতিহীন, প্রথাসর্বস্ব, স্থবির, সংকীর্ণ তা পরিত্যাগ করে এক পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়েই নজরুলের শিল্পচর্চা। তিনি প্রয়োজনে শৈলীগত দিককে উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন বৃহত্তর প্রয়োজনে সাহিত্যকে তুলে ধরার জন্য। এখানেই তাঁর অনন্যতা।

'বাঁধনহারা' আত্মজৈবনিক উপন্যাস?

উপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদা। তার কোনো বাঁধন নেই, তাই সে বাঁধনহারা। সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে নজরুলের মতোই নূরুল করাচি সেনানিবাসে গিয়েছে। নজরুল বাঙালি পল্টন থেকে কলকাতায় ফেরার কিছুদিন পরেই এই উপন্যাসটি ছাপার কাজ শুরু করেন। যদিও উপন্যাসটি তিনি রচনা করেছিলেন করাচিতে বসেই। রবিয়ল এবং মনুয়রকে লেখা চিঠি দুটো তার প্রমাণ। রবিয়লকে লিখেছেন, 'আজকাল খুব বেশি প্যারেড করতে হচ্ছে'। কখনও বা হাবিলদারজীর হাঁক পাড়ার প্রসঙ্গ আছে। আর মনুয়রকে লেখা চিঠিতে আছে ঝড়বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর করাচির প্রাকৃতিক বর্ণনা। উপন্যাসটি কেন বেশি মাত্রায় আত্মজৈবনিক? নূরুল হুদা চরিত্রে আছে নজরুল চরিত্রের ছায়া। 'বাঁধনহারা' উপন্যাসের 'নূরু' নামটিও নজরুলের ডাকনাম। 'পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ও তার প্রিয় বন্ধুকে এই নুরু নামেই ডাকতেন। বাঁধন হারা-র নায়ক নূরুল তার স্রষ্টার মত কবি ও সৈনি।' (সরকার,১৯৯৯, পৃ: ১৭৫) নজরুলের জীবনের

রোমান্টিকতা, বিদ্রোহ এবং বন্ধনহীন জীবন পরিচালনার মূল দিকগুলি নূরুল হুদা চরিত্রের মধ্যে লক্ষ করা যায়। নূরুলের জীবনে দুঃখ আছে এবং দুঃখকে অতিক্রম করার জন্যই সে ঘরছাড়া হয়েছে। মনুয়রকে নূরুল লিখেছে,

> "রবিয়লের স্নেহময়ী জ্যোতির্ময়ী জননীর কথা মনে হলে আমার মাতৃ-বিচ্ছেদ ক্ষতটা নতুন করে জেগে ওঠে। আমি কিন্তু বড্ডো অকৃতজ্ঞ! না?"

সম্ভবত নজরুলের নিজ মায়ের প্রতি যে হৃদয়বেদনা, সেই ব্যথা, ক্ষত উপন্যাসের কাহিনিতে রূপ পেয়েছে বলেই ধারণা করা যায়। অবশ্য একথা কখনও তিনি স্পষ্ট করেননি। জেলে অনশন চলাকালীন মায়ের সঙ্গে দেখা করা বা পরে কখনও ফিরে যাওয়ার কথা তিনি আর ভাবেননি। এত কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যই নিজেকে নিজেই বড্ড 'অকৃতজ্ঞ' বলে হৃদয়ক্ষত উন্মোচন করলেন। বাংলা সাহিত্যে নিজ জীবন নিয়ে উপন্যাস নজরুলের আগে ও পরে লেখা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' সৃষ্টি হয়েছে আগেই। আর 'বাঁধনহারা'র পরে লেখা হয়েছে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' (প্রকাশ ১৯২৯)। এখানে উপন্যাস ও লেখক-জীবন হয়ে ওঠে পরস্পরের পরিপূরক। আত্মজৈবনিক উপন্যাসে লেখকের চিন্তন-মনন-অভিমত, আশা-অনুভব-আত্মদ্বন্দ্ব-অনুশোচনা-- এইসব নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। আধুনিক আত্মজৈবনিক উপন্যাসে আত্মানুসন্ধানই হল প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নজরুল এই উপন্যাসে ব্যক্তি নজরুলকে নয়, তাঁর উদার অসাম্প্রদায়িক মনন, সমাজ ও দেশভাবনাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে তুলেছেন।

স্বাতন্ত্র্যময়ী নারী চরিত্রগুলির চিন্তার উৎকর্ষতা:

মাহ্বুবা:

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যা মাহ্বুবা ও নূরুল হুদার হৃদয়াবেগ। কিন্তু এরা কেউ কাউকে কোনো চিঠি লেখেনি। যদিও এই হৃদয়াবেগ চাপা থাকেনি। মনুয়রকে লেখা চিঠিতে নূরুল হুদা মাহ্বুবাকে গভীর ভালোবাসার কথা জানিয়েছে। অন্যদিকে মাহ্বুবাও মনের কথা জানিয়েছিল চল্লিশোর্ধ্ব এক জমিদারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর। এই বিয়েকে মনে করেছিল জাঁতা পেষা হয়ে মরবার যন্ত্র। কিন্তু সে মরতে চায় না। কোনোদিন সেই সফল পরিণতি সম্ভব নয়, কিন্তু সে আশায় আছে, একদিন দক্ষিণ হস্তের বরণমালা নুরুলের প্রতি দিয়ে তারপর জীবন থেকে মুক্তি নেবে। মাহ্বুবার সাহস এবং নারী হিসেবে আত্মস্বাতন্ত্র্য লক্ষ করার মতো। পুরুষদেরকে সে মনে করে 'স্ত্রী শিকারী'। স্বামীকে বলেছে, 'দুর্দান্ত পশু'। বলেছে, 'আমার স্বামী আমার রূপকে চেয়েছিলেন, রূপার দরে যাচাই করতে।' স্বামীকে শরীর এবং রূপ দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এজন্যই ভালোবাসা দেয়নি। ভালোবাসা তার হৃদয়ে ফল্গুধারার মতো বয়ে গিয়েছে নূরুলের উদ্দেশ্যে। মাহ্বুবা যেহেতু বিবাহিত, তাই তার ভালোবাসা ঝরে পড়েছিল সোফিয়ার প্রতি। সোফিয়াকেও সে মনে করেছে সূর্য।

সাহসিকা:

প্রগতিশীল, বিদুষী, স্বাতন্ত্র্যময়ী, ব্রাহ্ম স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাহসিকা। ব্রাহ্মস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। একসময় কৃতী ছাত্রী ছিলেন তিনি। তাঁর কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তিনি বলতেন, সব ধর্মের ভিত্তি চিরন্তন সত্যটিকে যখন মানি, তখন আমাকে যে ধর্মে ইচ্ছে ফেলতে পারিস। অনেক সমালোচক সাহসিকার মধ্যে দেখতে পান সরলা ঘোষালকে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। পুরো নাম-- মিস সাহসিকা বোস। তাঁর সই রেবাকে পত্র লিখেছেন কলকাতার বিডন স্ট্রিট থেকে। এই পত্রে ধর্মের প্রকৃত সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন তিনি। ধর্মীয় প্রবক্তারা প্রচার করেন মানবিকতা, উদারতা, সহৃদয়তা, পরমতসহিষ্ণুতার মহাবাণী। সাহসিকা জোরের সঙ্গেই বলেছেন-

> "প্রত্যেক ধর্মই সত্য-- শাশ্বত সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত এবং কোনো ধর্মকে বিচার করতে গেলে তার এই মানুষের গড়া বাইরের বিধান শৃঙ্খলা দিয়ে কখনও বিচার করবেনা..." (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৫৬)

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন 'মন্দিরে গিয়ে পূজা করা আর মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়াটাই কি ধর্মের সার সত্য?' (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৫৬-৩৫৭) ধর্মের নাম করে বিধর্মী আচরণ ভন্ড-ধার্মিকদের মজ্জাগত হয়ে গেছে। তাই বাইরের 'বিধি', আচরণকেই এরা বড়ো করে তুলে ধরার জন্য নানাভাবে প্রচার করেন ক্ষমতাবানের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। প্রকৃত অন্তরের সাধনা এদের নেই।

> "মন্দিরে গিয়ে দেবতার সামনে মুখস্ত মন্ত্র আওড়ায় কিন্তু তার মন থাকে লোকের সর্বনাশের দিকে। মসজিদে গিয়ে নামাজের 'নিয়ত' করেই ভাবে যত সব সংসারের পাপ দুশ্চিন্তা! এই ভণ্ডামি এই প্রতারণাই তো এঁদের সত্য!" (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৫৭)

আচার, বিচার, সংস্কার, জপ-তপ-মন্ত্র আওড়ানোর মধ্য দিয়ে মিথ্যা ধর্মের অভিনয় করে যারা, সেই বকধার্মিকদের মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন নজরুল। বলেছেন

> "এই বেচারারা অন্ধ বিশ্বাসীর দল? বেচারারা কিছু না পেয়েই পাওয়ার ভান করে চোখ বুজে বসে আছে। অথচ এদের শুধোও, দেখবে দিব্যি নাকি-কান্না কেঁদে লোকদেখানো ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বলবে, 'আঁ হাঁ হাঁ। মরি মরি ওই ওই ওই দেখ তিনি! মিথ্যার কি জঘন্য অভিনয় ধর্মের নামে সত্যের নামে। ঘৃণায় আপনিই আমার নাক কুঁচকে আসে।" (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৫৯)

ধর্ম সম্পর্কে সাহসিকার বিশ্লেষণ হল –

> "সব ধর্মেরই ভিত্তি চিরন্তন সত্যের পর যে সত্য সৃষ্টির আদিতে ছিল, এখনও রয়েছে এবং অনন্তেও থাকবে। এই সত্যটাকে যখন মানি, তখন আমাকে যে ধর্মে ইচ্ছা ফেলতে পারিস। আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্ম।" (ইসলাম, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৫৯)

এ যেন নজরুলের অন্তরের প্রতিচ্ছবি। দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়ে ফুটে ওঠে এক স্বচ্ছ নির্মল হৃদয়, যে হৃদয়-মন্দিরে নেই কোনো বিভেদ, বিধিনিষেধের গন্ডি। ধর্মের নামে ভণ্ডামি দেখে ক্ষোভে-বিরক্তিতে সাহসিকা বলেছেন,

> "এই সব কারণেই, ভাই, আমি এইরকম ভণ্ড আস্তিকদের চেয়ে নাস্তিকদের বেশি ভক্ত, বেশি পক্ষপাতী... তারা এই সত্যের স্বরূপ বুঝতে, এই সত্যকে চিনতে এবং সত্যকে পেতে দিবা-রাত্তির প্রাণপণ চেষ্টা করচে-- এই তো সাধনা-- এই তো পূজা, এই তো আরতি। এই জ্ঞান-পুষ্পের নৈবেদ্য চন্দন দিয়ে এরা পূজা করবে আর করচে, তবু দেবতাকে অন্তরে পায়নি বলে মুক্তকণ্ঠে আবার স্বীকারও করচে যে, কই দেবতা! কাকে পূজা করচি? আহা! কি সুন্দর সরল সহজ সত্য! এদের প্রতি ভক্তিতে আপনিই যে মাথা নুয়ে পড়ে।" (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৫৯)

নজরুল এ কারণেই 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় বলেছিলেন,

> "গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতিরাম ভাবে কনফুসি!" (ইসলাম, আমার কৈফিয়ৎ, ১৯২৬)

রাবেয়া:

আর রাবেয়া হলেন রবিয়লের স্ত্রী। তিনি সপ্রতিভ, স্বচ্ছন্দ যুবতী। তিনি শুধু নিজের পরিবার নয়, বহুজনের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি স্নেহময়ী। নারী - পুরুষের সম্পর্ক, দেশ এবং সমাজ সম্পর্কে তিনি স্পষ্টবক্তা। নূরুলের বন্ধু রবিয়ল। রবিয়লের স্ত্রী রাবেয়া সবার প্রিয় ভাবীজান। নূরুর প্রেমিকা মাহ্‌বুবাকে শুভাকাঙ্ক্ষী ভাবীজান 'ভাগ্যবতী' সম্বোধন করে সালার থেকে পত্র লিখেছে। এই পত্রে আছে প্রগতিশীল, বিদুষী, স্বাতন্ত্র্যময়ী, ব্রাহ্ম স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাহসিকা-র পরিচিতি। রাবেয়া বলেছে –

> "এঁদের সঙ্গে যে খুব সহজ সরল, স্বচ্ছন্দে প্রাণ খুলে মিশতে পারা যায়, এইটেই আমাকে আনন্দ দেয় সবচেয়ে বেশি। এঁদের মধ্যে ছোঁয়াচ রোগ বা ভূতমার্গের ব্যামো নেই, কোনো সংকীর্ণতা, ধর্ম-বিদ্বেষ বেহুদা বিধি-বন্ধন নেই। আজ বিশ্ব-মানব যা চায়, সেই উদারতা, সরলতা, সমপ্রাণতা যেন এর বাইরে-ভিতরে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো রয়েছে।" (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৩৫)

রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর'-এর অন্তর্গত 'লোকহিত' প্রবন্ধে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বলতা-অন্তর্বিভেদ মুদ্রিত করে রেখে গিয়েছেন।

> "হিন্দু - মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন হিন্দু স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র সংকোচবোধ করেন নাই।... আমরা বিদ্যালয়ে ও অফিসে প্রতিযোগিতার ভিড়ে মুসলমানকে জোরের সঙ্গে ঠেলা দিয়াছি।" (ঠাকুর ১৩৯৭, পৃ: ৫৪৯)

নজরুল উপন্যাসে রাবেয়াকে দিয়ে একথাই ফুটিয়ে তুললেন। রাবেয়ার অভিজ্ঞতা তো রবীন্দ্রনাথের দেশ নিয়ে উদ্বেগের প্রতিধ্বনি। রাবেয়ার চিঠিতে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যেকার পার্থক্যও উঠে এসেছে। হিন্দুধর্মের নানা কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় যে ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল, তার বিভিন্ন জটিলতা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে না ঢুকেও নজরুল সংস্কারমুক্ত মনন ও আচরণের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। রাবেয়ার চিঠিতে 'ব্রাহ্ম' ও 'হিন্দু' দুটি পরিবারের মহিলাদের ধর্মীয় আচরণ সম্পর্কে একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরলেন। রাবেয়া বলেছে,

> "আমরা বড়ো বড়ো হিন্দু পরিবারের সঙ্গেও মিশেছি, খুব বেশি করেই মিশেছি এবং অনেক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে ভাবও হয়েছিল, কিন্তু এমন দিল-জান খোলসা করে প্রাণ খুলে সেখানে মিশতে পারিনি। কোথায় যেন কী ব্যবধান থেকে অনবরত একটা অসোয়াস্তি কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে।" (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৩৫)

মানসিক জগতের এই ব্যবধান সামাজিক জীবনে চলার পথে কত সূক্ষ্মদাগে কাজ করে যায়। রাবেয়ার কথায়,

> "আমরা তাঁদের বাড়ি গেলেই, তাঁরা হন আর না হন, আমরাই বেশি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি, এই বুঝি বা কোথায় কী ছোঁয়া গেল, আর অমনি সেটা অপবিত্র হয়ে গেল। আমরা যেন কুকুর বেড়াল আর কী! তাঁরাও আমাদের বাড়ি এসে পাঁচ-ছয় হাত দূরে দূরে পা ফেলে ড্যাং পেড়ে পেড়ে আসেন, পাছে কোথায় কী অখাদ্য কুখাদ্য মাড়ান। এতে মানুষকে কতো ছোটো হয়ে যেতে হয়, তার বুকে কত বেশি লাগে।... ভিতরে এত অসামঞ্জস্য ঘৃণা- বিরক্তি চেপে রেখে বাইরের মুখের মিলন কি কখনও স্থায়ী হয়? এ মিথ্যা আমরা উভয়েই মনে মনে খুব বুঝি কিন্তু বাইরে প্রকাশ করিনে। পাশাপাশি থেকে এই যে আমাদের মধ্যে এত বড়ো ব্যবধান, গরমিল -- এ কী কম দুঃখের কথা? আমাদের আত্মসম্মান আর অভিমান এতে দিন দিনই বেড়ে চলেছে।" (ইসলাম, বাঁধনহারা, ২০০১, পৃষ্ঠা ৩৩৫)

নজরুল বারবার আশ্বস্ত করেছেন, প্রত্যেকেই নিজ ধর্মের সত্যকে জানুক। নিজের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস থাকলে, অন্য সকলকে বিশ্বাস কররার শক্তি পাবে। আর অন্য মানুষকে ঘৃণা করে তারাই, যাদের নিজের কোনো ধর্ম নাই। এই উদারতায় নবীনদেরকেই আহ্বান করেছেন তিনি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সেই দুর্বলতা, বিদ্বেষ, বিভেদের সাংঘাতিক রূপ তিনি দেখেছিলেন। রাগে - ক্ষোভে বলেছিলেন,

> "কি ভীষণ প্রতারণা! মিথ্যার কী বিশ্রী মোহজাল! এই দিয়া তুমি একটা অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে?" (ইসলাম, ২০০১, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩০)

নজরুলের মূল্যায়নে কয়েকটি প্রশ্ন:

অনেকে নজরুলের সাহিত্যকে প্রচারধর্মী বলেন, চড়া সুরের বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু যা সমাজ-বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, সমাজ অভ্যন্তরে নিহিত সত্যকে তুলে ধরে, তাকে শুধুই প্রচারধর্মী আখ্যা দেওয়া সঙ্গত নয়। নজরুল সাহিত্য সমাজের সঙ্গে অন্বিত অর্থনীতি, রাজনীতিকে তুলে ধরে। আর এই রাজনৈতিক ধ্যানধারণা, মেহনতি মানুষের ঘামে-অশ্রুতে সিক্ত। নজরুল-সৃষ্ট নারীরা স্বাতন্ত্র্যময়ী। তাঁরা নবজাগরণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। নজরুলের সাহিত্য নিয়ে মূল্যায়ন করতে হলে সমসাময়িক হিন্দু ও মুসলমান লেখকদের পাশাপাশি রেখে বিশ্লেষণ করা দরকার। অবিভক্ত বাংলাদেশের জনসমষ্টিতে শতকরা হিসেবে মুসলমানদের সংখ্যাই ছিল বেশি। কিন্তু মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছে হিন্দু মধ্যবিত্ত বিকাশের তুলনায় দেরিতে। নজরুলের সময়ে মুসলমান মধ্যবিত্তরা হিন্দু মধ্যবিত্তদের ভয়ের চোখে দেখত। তার চেয়ে বড়ো কথা, মুসলমানদের মধ্যে দরিদ্র, যারা সংখ্যায় বেশি, তাদের সমাজ ছিল দেশের শিক্ষিত - মধ্যবিত্ত শ্রেণির থেকে বহু দূরে। তারা তখন অতিমাত্রায় নিজেদের সমাজের বাইরে পা ফেলতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল।

শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন,

> "সাহিত্য সাধনা যদি সত্য হয়, সেই সত্যের মধ্যেই ঐক্য একদিন আসবেই। কারণ সাহিত্য - সেবকেরা পরস্পরের পরমাত্মীয়।" (চট্টোপাধ্যায় ১৩৯৩, পৃ: ২১৬৯)

নজরুল আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন,

> "হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ-অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে। ...আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্যে অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।" (ইসলাম, ২০০১ দ্বিতীয় খন্ড, পৃ: ৫০৭- ৫০৮)

নজরুলের এই দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বাঁধনহারা'র অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

উপসংহার:

নজরুলের উপন্যাসগুলিতে ধরা দিয়েছে বাস্তব জীবনকাহিনি। চরিত্রগুলি সবই মৌলিক, কিন্তু কাহিনি মুসলমান সমাজের। তিনি সত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে সাহিত্যের শৈলীগত দিককেও তুলনায় লঘু করে দেখতে চেয়েছিলেন। সমাজ এবং মানুষের স্বার্থ তাঁর কাছে প্রধান। নজরুলের উপন্যাস তো আজও অপাঙংক্তেয় থেকে গিয়েছে! কিন্তু কেন? সেজন্যই কি মুসলমান সম্পাদক এবং মুসলমান গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত পত্রিকা ছাড়া অন্যত্র নজরুলের উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হলো না? পরবর্তী সময়েও তা খুব একটা প্রাসঙ্গিক বলে দিক্‌পাল সমালোচক, গবেষকরা মনে করছেন না! আজ দেশ ও বিশ্বের পরিস্থিতির দিকে তাকালে যে ভয়াবহ মনুষ্যত্বহীনতা চোখে পড়ে, সামাজিক দায়িত্বহীনতা হৃদয়কে বিদীর্ণ করে, সম্প্রদায়গত বিভেদ যেভাবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে- তখন নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:

১. ইসলাম, নজরুল, প্রত্যভিভাষণ, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১
২. ইসলাম, নজরুল, বাঁধনহারা, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০১
৩. ইসলাম, নজরুল, যুগবাণী, কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র, প্রথম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০১
৪. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, মুসলমান সাহিত্য সমাজ, শরৎ সাহিত্য সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড, আনন্দ, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৩
৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭
৬. সরকার, তারক, ঔপন্যাসিক নজরুল, একবিংশতি -১, মে ১৯৯৯